ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ২৮৯-৩০৮
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4119

বাংলাদেশের চিংড়ি-শিল্প: পরিপ্রেক্ষিত কক্সবাজার

কানিজ ফাতেমা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Cox's Bazar has been an economically prosperous area since time immemorial. Its natural resources, forest resources, mineral resources, and fisheries resources play an important role in the national economy. Apart from various cottage industries including bamboo and cane craft, clay craft, shell craft, salt industry, handicrafts, the shrimp industry is a significant industry in Cox's Bazar. It is possible to earn foreign currency and increase rural employment at a notable rate through exports from the various sectors of the post-independence country among which the fisheries sector, especially the coastal shrimp resource is one of them. The high-quality shrimp from Cox's Bazar is meeting the country's demand and earning billions of dollars in foreign currency through exports. The fisheries sector is the second major foreign currency earner after the ready-made garment industry, the majority of which comes from the shrimp industry. Due to the increasing demand for shrimp in the international market, shrimp farming has significantly changed the economic activities of coastal areas over the past few decades and has been playing a particularly important role in the national economy of Bangladesh. Shrimp is a potentially lucrative industry. However, there are still some limitations to the expansion of this industry. This aspect has been highlighted in this research article. In our national economy the contribution of the shrimp industry, its origin, farming methods, import-export processes, and the necessity of various initiatives for its development have been presented through intensive research, observation, and analysis.

Key Words: Cox's Bazar, Economy, Export-Import, Shrimp Industry, Geographical Indicator (GI).

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে পাহাড়, নদী ও সমুদ্রবেষ্টিত ঐতিহাসিক জনপদ কক্সবাজার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র উপকূলে যতগুলো শহর রয়েছে তার মধ্যে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দিক থেকে কক্সবাজার শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এ সমুদ্র সৈকতটি

অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। স্মরণাতীতকাল থেকে কক্সবাজারের সমুদ্র সম্পদ, বনজ সম্পদ, কৃষিজাত সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ তথা চিংড়ি-শিল্প এদেশের অর্থনীতিতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ দেশের মোট উৎপাদিত চিংড়ির বেশিরভাগই উৎপাদিত হয় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরায়। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি শিল্পের ভূমিকা সুবিদিত এবং স্বীকৃত। বর্তমানে চিংড়ি হ্যাচারি, চিংড়ি নার্সারি, চিংড়ি চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ডিপো, আড়ত, অবতরণ কেন্দ্র, চিংড়ি খাদ্য ও আহরণ সামগ্রী তৈরি এবং পরিবহন ইত্যাদি কাজে প্রায় ১.৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য চিংড়ি সেক্টরে নিয়োজিত রয়েছে।[১] বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আশির দশকে সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চিংড়ি চাষ কার্যক্রমের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ উন্নয়নের পথ ধরে নব্বইয়ের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারের কাছে এটি অগ্রাধিকার ও লাভজনক শিল্প হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে চিংড়ি এককভাবে অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের প্রসার ঘটেছে। পরিকল্পিতভাবে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি চিংড়ি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে চিংড়ি খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের কৌশল গ্রহণ খুবই জরুরি। প্রাপ্ত তথ্য মতে, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে তেমন কোনো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। সে বিবেচনা থেকে আলোচ্য প্রবন্ধে কক্সবাজার জেলার চিংড়ি-শিল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও এর সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এ প্রবন্ধ রচনায় তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ এবং মাঠ পর্যায়ের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের কক্সবাজারে চিংড়ি-শিল্পের বর্ণনা করতে গিয়ে এ শিল্পের পটভূমি, চাষ পদ্ধতি, উৎপাদন, রপ্তানি আয়, পুষ্টিগুণ, বর্তমান অবস্থা, পরিবেশের ক্ষতিকর দিক, এ শিল্পের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রভৃতি বিষয় যথেষ্ট বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর ব্যাপক ভূমিকা রাখছে বিধায় সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নানা মাত্রিকতা তুলে ধরা প্রয়োজন। এ প্রবন্ধ গবেষণায় তথ্যসূত্র হিসেবে *বাংলাদেশ গেজেট*, *Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh*, *ফিশারিজ ইন্‌ফরমেশন বুলেটিন*, মৎস্য অধিদপ্তর, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, *বাংলাপিডিয়া*, কক্সবাজার

জেলা তথ্য বাতায়ন, প্রকাশিত বই, কক্সবাজার জেলার মৎস্য অধিদপ্তরের লেখা প্রবন্ধ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সরেজমিনে পরিদর্শন এবং স্থানীয় চিংড়ি চাষি ও রপ্তানিকারকদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

চিংড়ি-শিল্পের (চাষের) পটভূমি

আঠারো শতকের সূচনালগ্নে বাংলা একটি সমৃদ্ধিশালী ও বর্ধিষ্ণু প্রদেশরূপে সুপরিচিত ছিল। এর বিপুল প্রাচুর্যের জন্যই এ দেশটিকে জান্নাতাবাদ বা স্বর্গরাজ্য, জান্নাতুল বালাদ বা শহরের স্বর্গ, ভারতের স্বর্গ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হতো।[২] এর সম্পদের আকর্ষণেই দূর-দূরান্ত থেকে বিদেশি বণিকেরা বাংলার উপকূলে এসে ভিড় জমাতো। তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য বর্ণনায় এ অঞ্চলের গৌরবগাঁথা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এটি এমন একটি আকর্ষণীয় স্থান, যেখানে প্রবেশের জন্য রয়েছে হাজারো উন্মুক্ত দরজা, কিন্তু ফিরে যাওয়ার জন্য একটিও নয়'।[৩] এ জাতির সম্পদ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এদেশের উর্বর মাটি, যেখানে ফলত ধান, গম এবং অন্যান্য শস্য যেমন আখ, তুলা, আফিম, নীল এবং বিভিন্ন রকমের তেল ও সবজি জাতীয় কৃষিপণ্য। অর্থনৈতিক দিক থেকে মূল্যবান অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে এখানে উৎপন্ন হতো প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা, মোম, লম্বা মরিচ, লবণ এবং শোরা। কিন্তু আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে বাংলা হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন জাতের তুলা এবং সিল্কের তৈরি পণ্যের এক অসাধারণ ভাণ্ডার। এ পণ্য শুধু মুগলদের সাম্রাজ্য হিন্দুস্থানেই ব্যবহৃত হতো না, এ পণ্য যেত ব্রিটেনে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও। এ পণ্যগুলি শুধু যে চমৎকার মসৃণতা এবং মিহি কারুকার্যের জন্যই খ্যাত ছিল তাই নয়, তুলনামূলকভাবে দামেও ছিল সস্তা।[৪]

পরবর্তীতে ঊনিশ এবং বিশ শতকে পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্পের উৎপত্তি, প্রসার এবং বাণিজ্যিকীকরণ ছিল বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অলোচ্য বিষয়। তদ্রুপভাবে পাকিস্তান আমলে কাগজ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। বৈশ্বিক আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, মানুষের রুচি ও চাহিদার পরিবর্তনের ফলে পুরাতন শিল্পগুলোর জায়গায় স্থান করে নেয় নতুন নতুন শিল্প যেমন- তৈরি পোশাক শিল্প। স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ইতিহাসে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ। এদেশের বনজ ও মৎস্য সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। খাদ্য রুচির পরিবর্তন, বৈশ্বিক চাহিদা, ভূ-প্রকৃতিগতভাবে উপকূলীয় অঞ্চল সুবিধা থাকায় এখানে মৎস্য সম্পদ বিশেষ করে চিংড়ি শিল্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়।

বাংলাদেশে একসময় বিভিন্ন নদ-নদী, খাল-বিল, উপকূলীয় অগভীর এলাকা ও গভীর সাগর থেকে চিংড়ি সংগ্রহ করে তা বাজারজাত করা হতো। বাংলাদেশে প্রথম ১৯২৯-৩০ সালে সুন্দরবন অঞ্চলে চিংড়ি চাষের সূচনা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।[৫] ১৯৫০ সালের পূর্বে সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলে নদী সংলগ্ন এলাকায় মাটি দিয়ে পাড় বেঁধে ঘের বা

পুকুর তৈরি করা হতো। ঘের বা পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত খাদ্য থেকে চিংড়ি কয়েক মাসের মধ্যে বড় হলে তা সংগ্রহ করে বাজারজাত করা হতো। ১৯৫০ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উপকূলীয় বন্যা প্রতিরোধ ও পানি নিষ্কাশন উপকূলীয় বাঁধ তৈরির পরপরই দেশের সনাতন পদ্ধতির চিংড়ি চাষ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ষাটের দশকে দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ারের পানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়। ফলে বিভিন্ন আকারের বহুসংখ্যক পোল্ডারের[৬] সৃষ্টি হয়। এর আগে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় নিম্নভূমি ছিল প্রকৃতপক্ষে উপকূলীয় মৎস্য ও চিংড়ির প্রাকৃতিক আবাসস্থল। পোল্ডার সৃষ্টির পর প্রাথমিক পর্যায়ে সেগুলোতে ধানের চাষ সম্প্রসারিত হয়। ফলশ্রুতিতে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে প্রাকৃতিক মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদন ব্যাহত হয়। ঐ সময় দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কোনো কোনো পোল্ডারে শুধু লবণ চাষ এবং অল্প কিছু এলাকায় ধান চাষ হতো। সত্তরের দশকে এই পোল্ডারগুলোতে লোনাপানি ধরে রেখে চিংড়ি চাষের সূচনা হয়।[৭] সত্তর দশকের পর বিশ্ববাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁধের অভ্যন্তরে পুনরায় চিংড়ি চাষের সূচনা হয়। বস্তুত চিংড়ি চাষ তখনো বিজ্ঞানসম্মতভাবে চালু হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করে ঘেরে লালন-পালন করা হয়। খুলনা, বাগেরহাট, পাইকগাছা ও সাতক্ষীরা উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়াও বর্তমানে চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার, মহেশখালী, চকরিয়া উপজেলার সুন্দরবন, কুতুবদিয়া ও টেকনাফে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে এই চিংড়ি চাষ পরবর্তীতে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক অমিত সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা উত্তর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে কক্সবাজারের সন্নিকটে খুরুশ্‌কুল এবং চকরিয়ায় প্রথম বেড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে বাগদা চিংড়ির আধুনিক চাষ শুরু হয়। উপকূলীয় জেলাসমূহের মধ্যে কক্সবাজার এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে লবণ উৎপাদন মাঠে স্থানীয় জনগণ বহুদিন হতে বিক্ষিপ্তভাবে ছোট আকারের ঘোনায় চিংড়ি চাষ করে আসছে। এ জেলার চকরিয়া উপজেলায় সুন্দরবন এলাকার পালাকাটা, রামপুরা, চরণদ্বীপ ও রিং ভং মৌজায় প্রায় ৫০০০/৬০০০ হেক্টর (১৩-১৪ হাজার একর) জোয়ার প্লাবিত ভূমি বন বিভাগের সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু এই এলাকায় অর্থকরী বন সৃষ্টি সম্ভব হয়নি বিধায় সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল নগণ্য। এসব জমি চিংড়ি চাষের আওতায় এনে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে সরকারি সিদ্ধান্তে মৎস্য বিভাগ প্রাথমিকভাবে ২০২৪ হেক্টর (৫০০০ একর) ভূমি বার্ষিক হেক্টর প্রতি ২৪৭ টাকা (একর প্রতি ১০০ টাকা) খাজনায় ৩৯ জন উৎসাহী ও আগ্রহী চিংড়ি চাষিদের মধ্যে অস্থায়ী বন্দোবস্তী প্রদান করে। ১৯৮৫-৮৬ সালে উক্ত এলাকাসমূহ ১০ একর প্লটে পরিণত করে বার্ষিক হেক্টর প্রতি ৩৭০৫ টাকা (একর প্রতি ১৫০০ টাকা) খাজনায় উৎসাহী ও আগ্রহী চিংড়ি চাষিদের মধ্যে ১০ বৎসর মেয়াদী বন্দোবস্তী প্রদান করা হয়।[৮]

১৯৮২ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) অর্থানুকূল্যে মৎস্য বিভাগের মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) দুইটি উপ-প্রকল্প কক্সবাজারে গ্রহণ করা হয়। এদের মধ্যে একটি স্বাদু পানির চিংড়ি (গলদা) পোনা উৎপাদন কেন্দ্র, কক্সবাজারস্থ বিমান বন্দরের নিকট অবস্থিত এবং উপ-প্রকল্পের আওতায় চকরিয়া উপজেলার রামপুরায় বাগদা চিংড়ির একটি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। একই সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রদর্শনী চিংড়ি চাষ প্রকল্পের অধীনে কক্সবাজারে একজন খামার ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয় এবং পরবর্তীতে কক্সবাজারের বাঁকখালীতে চিংড়ি খামার প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিংড়ি চাষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থানুকূল্যে ১৯৮৫-৮৬ সালে চিংড়ি চাষ প্রকল্প (আইডিএ) নামে একটি প্রকল্পের কাজ কক্সবাজারে শুরু করে। এ প্রকল্পে চিংড়ি চাষ এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নসহ চিংড়ি চাষিদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সময় কক্সবাজার জোনে একটি সম্প্রসারণ ইউনিট, একটি প্রদর্শনী খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাগদা চিংড়ি প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া চিংড়ি পোনা উৎপাদনের জন্য ব্যক্তি মালিকানায় ৯টি বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়।[৯]

সারণি ১ : কক্সবাজার জেলায় উপজেলাভিত্তিক চিংড়ি চাষ খামারের সংখ্যা ও আয়তন, ১৯৮৬ জরিপ অনুযায়ী[১০]

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	খামারের সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
১	চকরিয়া	৫২০	১০৮৩৬.৪৩
২	মহেশখালী	২৬৬	৮৯৬৩.২২
৩	কক্সবাজার সদর	১০৯	২১৩৮.২০
৪	টেকনাফ	৬৬	৮৫৪.৫৩
৫	উখিয়া	৪৭	৬১৬.৭২
৬	রামু	২৭	২৩০.৪২
৭	কুতুবদিয়া	২৭	৪৮৫.০২
	মোট	১০৬২	২৪১১৪.৫৩

সূত্র: *ফিশারিজ ইন্‌ফরমেশন বুলেটিন*, ভলিউম ৩, ১৯৮৬ ইং (*কক্‌সবাজারের ইতিহাস*, কক্‌সবাজার ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদিত; কক্‌সবাজার, ৩০ জুন ১৯৯০, পৃ. ৩৯৬)

১৯৮৮ সালে দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিবি) আওতায় কক্সবাজার জেলায় ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে ১০-২৫ একর বিশিষ্ট মোট ৩৬ টি চিংড়ি খামারে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে একটি সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এছাড়া সমুদ্রের পাড় হতে পোনা ধরার পদ্ধতির উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। চিংড়ি চাষের ব্যাপকতা অনুধাবন করে কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান চিংড়ি চাষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে চিংড়ি চাষ উৎপাদনের

ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে। এর মধ্যে মেসার্স আল্লাহ ওয়ালা লিমিটেড, মেসার্স বেক্সিমকো ফিশারিজ লিমিটেড, একোয়াকালচার ফার্ম লিমিটেড, মেসার্স মেঘনা ফিশারিজ লিমিটেড এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে মেসার্স মেঘনা ফিশারিজ লিমিটেড ১৯৮৬ সালে চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রপতির রপ্তানি পদক' লাভ করে।[১১]

চিংড়ি চাষ (উৎপাদন) পদ্ধতি

চিংড়ি শিল্পের কয়েকটি চাষ পদ্ধতি রয়েছে। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও দ্বৈতয়িক উৎসের মাধ্যমে নিম্নোক্ত তিনটি চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়।

(ক) এককভাবে চিংড়ি চাষ

একক চিংড়ি চাষ বলতে প্রধানত উপকূলীয় এলাকার বাগদা চিংড়ির চাষকেই বোঝায়।[১২] যেখানে জোয়ার-ভাটার প্রভাব রয়েছে সে এলাকা একক চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগী। কক্সবাজার জেলার চিংড়ি খামারগুলির অধিকাংশই বাঁধের ভেতরে অবস্থিত। এগুলি এককভাবে চিংড়ি চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি আদর্শ খামারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা হলো, খামারকে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বেষ্টনী বাঁধের ব্যবস্থা রাখা। বেষ্টনী বাঁধ সাধারণত ২-৩ মিটার উঁচু হয়, যেন সর্বোচ্চ জোয়ারের সময়ও বাঁধের উপর দিয়ে খামারে পানি ঢুকতে না পারে। এছাড়া খামারে পানি ও চিংড়ির পোনা ঢুকানোর জন্য হেড ক্যানাল এর ব্যবস্থা থাকে। প্রকল্প থেকে প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশনের জন্য ফিডার ক্যানাল থাকে। অনেক সময় অভ্যন্তরীণ বাঁধ নির্মাণ করে খামারে পোনা প্রতিপালনের জন্য ছোট ছোট নার্সারি পুকুর তৈরি করা হয়। খামারের প্রতিটি পুকুরে সঠিকমাত্রায় পানির গভীরতা বহাল রাখতে স্লুইস গেট এর ব্যবস্থা থাকে। স্লুইস গেট চিংড়ি খামারের অন্যতম প্রধান অবকাঠামো। বড় আকৃতির প্রধান স্লুইস গেট ফিডার ক্যানাল এর মুখে বসাতে হয়। অল্প ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার জন্য সাধারণত কাঠের তৈরি গেট ব্যবহার করা হয়।[১৩]

বড় আকারের খামার ২০-২২ একর পর্যন্ত হয়। খামারের নার্সারি পুকুরের আয়তন সাধারণত পালন পুকুরের ১০ ভাগের ১ ভাগ হয়ে থাকে। পালন পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার পর্যন্ত এবং নার্সারি পুকুরের গভীরতা ০.৭৫ মিটার। প্রতিবার চিংড়ি চাষ শুরু করার পূর্বে পুকুর থেকে পানি সম্পূর্ণ বের করে নিতে হয়। পুকুরে খাদ্য ঘাটতি রোধের জন্য হেক্টর প্রতি ২৫০ কেজি জৈব সার এবং ৫০ কেজি অজৈব সার প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পরে পানির গভীরতা ৪০-৫০ সেমি রেখে ১ সপ্তাহ পর পোনা ছাড়তে হয়।

খামারে দুভাবে পোনা মজুত করা হয়। সারা বছরই উপকূলীয় নদী ও খালে চিংড়ির লার্ভা পাওয়া যায়। সাধারণত পানির উপর স্তরে লার্ভা বাস করে। সে কারণে পানি প্রবেশ পথের

স্লুইস গেট এমনভাবে খুলে দেওয়া হয় যেন জোয়ারের সময় কেবল উপর স্তরের পানি ঘেরে প্রবেশ করে। এ পানির সংগে চিংড়ির লার্ভা খামারে ঢুকে। বাগদা চিংড়ি সাধারণত ৪ মাসের মধ্যে গড়ে ৫০-৬০ গ্রাম ওজন হয় এবং তখন তা বাজারজাত করা যায়। উন্নততর পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা করলে হেক্টর পতি ৫০০-৬০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।[১৪]

চিত্র ১: বাগদা চিংড়ি

চিত্র ২: গলদা চিংড়ি

সূত্র : সরেজমিনে পরিদর্শনকালে কক্সবাজার মৎস্য অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ছবি, তারিখ: ২৩ জুলাই ২০২২

(খ) পর্যায়ক্রমে চিংড়ি ও ধান চাষ

এ পদ্ধতিতে ঘেরের ভেতরে পুকুরে পালাক্রমে চিংড়ি ও ধান চাষ করা হয়। শীত মৌসুমে ঘেরের ভেতর জোয়ারের পানি ঢুকিয়ে চিংড়ি চাষ এবং বর্ষার আগে চিংড়ি আহরণ করে একই ঘেরে ধান ও অন্যান্য মাছ চাষ করা হয়। জোয়ারের পানির সঙ্গে চিংড়ির লার্ভা ও অন্যান্য লোনাপানির মাছের পোনা প্রবেশ করে। বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই মাসে চিংড়ি আহরণ করা হয়।

(গ) পর্যায়ক্রমে লবণ উৎপাদন ও চিংড়ি চাষ

পর্যায়ক্রমে লবণ উৎপাদন ও চিংড়ি চাষ চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও কক্সবাজারের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় পর্যায়ক্রমে একই জমিতে লবণ উৎপাদন ও চিংড়ি চাষের প্রথা চালু আছে। এখানে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত লবণ উৎপাদন করা হয়। মে মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চিংড়ি চাষ করা হয়।

এছাড়া পানির লবণাক্ততার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের চিংড়ি চাষকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন : অল্প লোনাপানির চিংড়ি চাষ ও স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ।

অল্প লোনাপানির চিংড়ি চাষ

বস্তুত বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ বলতে অল্প লোনাপানির চিংড়ি চাষকেই বোঝায়। উপকূলীয় এলাকায় চাষকৃত চিংড়ি প্রজাতির মধ্যে বাগদা চিংড়ির গুরুত্ব বেশি যা অল্প লোনাপানিতেই

চাষ করা হয়। মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগই বাগদা চিংড়ি। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার জেলায় দেশের প্রায় সব চিংড়ি খামার অবস্থিত। এ দুটি অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ১,৪৫,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে।[১৫]

স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ

স্বাদুপানিতে এখনো ব্যাপকভাবে চিংড়ি চাষ শুরু হয়নি। দেশে স্বাদু পানিতে চাষ উপযোগী চিংড়ি হচ্ছে গলদা চিংড়ি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের সর্বত্রই এ চিংড়ির বিচরণ। গলদা চিংড়ি স্বাদু পানিতে বাস করলেও প্রজনন মৌসুমে ডিম ছাড়ার জন্য ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে চলে আসে। তাই মোহনা ও খাড়ি অঞ্চলের নদীতে যেখানে জোয়ার-ভাটা হয় সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে এদের প্রচুর লার্ভা পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে এখন কক্সবাজার, চট্টগ্রামের পটিয়া, নোয়াখালীর ব্যাকইয়ার্ড হ্যাচারি এবং আরও কয়েকটি হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে।[১৬]

চিংড়ির উৎপাদন ধারা

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে চিংড়ির মোট উৎপাদন ১২৫৬৯৯ মেট্রিক টন। তৎমধ্যে কক্সবাজারে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে ১৩১২৩.৯৪ মে. টন। এর মধ্যে বাগদা ৯৩৩৬.১৬, গলদা ৮২২.৫৮ এবং অন্যান্য চিংড়ি ২৯৬৫.২০ মে. টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে চিংড়ির মোট উৎপাদন ছিল ১৩০২৯৬ মে. টন। এর মধ্যে কক্সবাজারে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে ১৪৮১৯.৯২ মে. টন। এর মধ্যে বাগদা ১১১২৫.৫০, গলদা ৫৭৩.৪২ এবং অন্যান্য চিংড়ি ৩১২১ মে. টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে চিংড়ির মোট উৎপাদন ছিল ১২২৫৫০ মে. টন। এর মধ্যে কক্সবাজারে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে ১২৭৩৩.১৫ মে. টন। এর মধ্যে বাগদা ১০১৭৫, গলদা ৪৫৪.০৬ এবং অন্যান্য চিংড়ি ২১০৪.০৯ মে. টন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট চিংড়ির উৎপাদন ছিল প্রায় ১২৫১১০ মে. টন। আর উৎপাদিত চিংড়ির ৪০ হাজার মে. টন চিংড়ি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মিটিয়েছে। এ অর্থবছরে কক্সবাজারে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে ১৩২৯৮.৮৫ মে. টন। এর মধ্যে বাগদা ১০৯২৫.৬০, গলদা ৩৮০.৫০ এবং অন্যান্য চিংড়ি ১৯৯২.৭৫ মে. টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে চিংড়ির মোট উৎপাদন ১২৭৬০১ মে. টন। তৎমধ্যে কক্সবাজারে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে ১১৬১৯.৩০ মে. টন। এর মধ্যে বাগদা ৯০৮৫, গলদা ১৫৬.৩০ এবং অন্যান্য চিংড়ি ২৩৭৮ মে. টন। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে চিংড়ির মোট উৎপাদন ১৩১৫০৯ মে. টন। এই অর্থবছরে কক্সবাজারে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে ১৬০৫১.৩০ মে. টন। এর মধ্যে বাগদা ১৩৩৪৩, গলদা ২৭৯.৩০ এবং অন্যান্য চিংড়ি ২৪২৯ মে. টন।

সারণি ২: ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশে প্রজাতি ভিত্তিক চিংড়ির মোট উৎপাদন[১৭]

অর্থ বছর	বাগদা	গলদা	হরিণা	চাকা	অন্যান্য চিংড়ি	মোট উৎপাদন (মে. টন)
২০১৫-১৬	৬৮,২১৭	৪৬,১৮৯	৩,৮০৬	২,১৫৮	৫,৩২৯	১,২৫,৬৯৯
২০১৬-১৭	৬৮,২৭২	৪৮,৫৭৪	৩,৯৫৭	২,৪৫২	৭,০৪১	১,৩০,২৯৬
২০১৭-১৮	৬১,৭০৯	৫১,৫৭১	৩,৮৮২	২,০২৯	৩,৩৫৯	১,২২,৫৫০
২০১৮-১৯	৬৩,১৭১	৫২,১৯৭	৪,১০৫	২,০৯৮	৩,৫৩৯	১,২৫,১১০
২০১৯-২০	৬৪,৬৮৮	৫১,০৯৬	৪,৯৭৯	২,৫৪৫	৪,২৯৩	১,২৭,৬০১
২০২০-২১	৬৮,৭০৪	৫০,৭৫০	৫০৭৯	২,৫৯৫	৪,৩৮১	১,৩১,৫০৯

Source: Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh Fiscal Year 2015-16 to 2020-21, (2015-16, p. 41, 2016-17, p. 55, 2017-18, p. 61, 2018-19, p. 64, 2019-20, p. 65, 2020-21, p. 64)

সারণি ৩: ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কক্সবাজারের খামারে চিংড়ির বার্ষিক মোট উৎপাদন [১৮]

কক্সবাজার	আয়তন (হেক্টর)				চিংড়ি উৎপাদন (মে. টন)			
অর্থ বছর	বাগদা	গলদা	অন্যান্য চিংড়ি	মোট	বাগদা	গলদা	অন্যান্য চিংড়ি	মোট চিংড়ি
২০১৫-১৬	৪৪,১৬৬.২৩	১৩০.৫৭	-	৪৪,২৯৬.৮০	৯,৩৩৬.১৬	৮২২.৫৮	২,৯৬৫.২০	১৩,১২৩.৯৪
২০১৬-১৭	৪৪,২২৭.৯০	১৫৩.৩০	-	৪৪,৩৮১.২০	১১,১২৫.৫০	৫৭৩.৪২	৩,১২১.০০	১৪,৮১৯.৯২
২০১৭-১৮	৪০,৯২৬.৪০	১৮৬.১১	-	৪১,১১২.৫১	১০,১৭৫.০০	৪৫৪.০৬	২,১০৪.০৯	১২,৭৩৩.১৫
২০১৮-১৯	৪১,৪৩৭	৯৪.৩২	-	৪১,৫৩১.৩২	১০,৯২৫.৬০	৩৮০.৫০	১,৯৯২.৭৫	১৩,২৯৮.৮৫
২০১৯-২০	৪৪,৫২৮	১২৯.৩২	-	৪৪,৬৫৭.৩২	৯,০৮৫	১৫৬.৩০	২,৩৭৮	১১,৬১৯.৩০
২০২০-২১	৪২,০২৮	১২৯.৩২	-	৪২,১৫৭.৩২	১৩,৩৪৩	২৭৯.৩০	২,৪২৯	১৬,০৫১.৩০

Source: Report from Deputy Director (Shrimp), Dhaka and District Fisheries Offices. Other Shrimp/Prawn: Harina, Chaka and other small shrimp/prawn. Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh Fiscal Year 2015-16 to 2020-21, (2015-16, p. 40, 2016-17, p. 54, 2017-18, p. 60, 2018-19, p. 63, 2019-20, p. 64, 2020-21, p. 63)

বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানি থেকে আয়ের তালিকা

স্বাধীনতার পর হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ২.৩৮ কোটি টাকা। অত:পর সরকারের মৎস্য খাতে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি দুটোই বৃদ্ধি পায়। যার ফলশ্রুতিতে এ খাতে রপ্তানি আয় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৬৩৮.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ৫০০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। মৎস্য অধিদপ্তর ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এর তথ্য মতে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই খাত থেকে আয় হয় ৫৬৮.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আয় হয়েছিল ৫৩৫.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আয় হয় ৫২৬.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আয় হয় ৫০৮.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ৫০০.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ৪৫৬.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৭৭.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৩৩ কোটি মার্কিন ডলার ধরা হয়।[১৯]

সারণি ৪: ২০১৩-১৪ থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানি আয়

অর্থ বছর	রপ্তানি আয় (মি. মাঃ ডলার)	রপ্তানি আয় (কোটি টাকা)	বৃদ্ধি/হ্রাসের হার (টাকায়)
২০১৩-১৪	৬৩৮.১৯	৫১০৫.৫২	--
২০১৪-১৫	৫৬৮.০৩	৪৪৩০.৬৩	-১৩.২২%
২০১৫-১৬	৫৩৫.৭৭	৪২৮৬.১৬	-৩.২৬%
২০১৬-১৭	৫২৬.৪৫	৪২১১.৬০	-১.৭৪%
২০১৭-১৮	৫০৮.৪৩	৪০০৮.২৮	-৪.৮৩%
২০১৮-১৯	৫০০.৪৬	৪২২৮.৩৮	+৫.৪৯%
২০১৯-২০	৪৫৬.১৫	৩৮৭০.৪৩	-৮.৪৬%
২০২০-২১	৪৭৭.৩৭	৪০৮৬.২৫	+৫.৫৭%

সূত্র: *businesshour24.com*, তারিখ : ৯ মে, ২০২২

কক্সবাজারের চিংড়ি রপ্তানি থেকে আয়ের তালিকা

মৎস্য অধিদপ্তর ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এর তথ্য মতে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কক্সবাজার চিংড়ি রপ্তানি করে আয় করেছিল ৫৫ কোটি ৯৩ লাখ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আয় হয় ৫৯ কোটি ৮৭ লাখ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আয় হয় ৫২ কোটি ৮২ লাখ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ৫৩ কোটি ১৯ লাখ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ৪১ কোটি ৫৩ লাখ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ৫৮ কোটি ২৬ লাখ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২০]

সারণি ৫: ২০১৫-১৬ থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছরে কক্সবাজোরের চিংড়ি রপ্তানি আয়

অর্থ বছর	রপ্তানি আয় (মি. মার্কিন ডলার)	রপ্তানি আয় (কোটি টাকায়)
২০১৫-১৬	৫৫.৯৩	**৫৬৬.৫৭**
২০১৬-১৭	৫৯.৮৭	**৬০৬.৪৮**
২০১৭-১৮	৫২.৮২	**৫৩৫.০৬**
২০১৮-১৯	৫৩.১৯	**৫৩৮.৮১**
২০১৯-২০	৪১.৫৩	**৪২০.৬৯**
২০২০-২১	৫৮.২৬	**৫৯০.১৭**

সূত্র : মৎস্য অধিদপ্তর ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে সংগৃহীত।

কক্সবাজার জেলার চিংড়ি সম্পদ ও মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড[২১]

চিংড়ি সম্পদের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের দিক থেকে কক্সবাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগরের বিপুল লবণাক্ত জলরাশির পাশাপাশি উপকূলীয় অর্ধ-লবণাক্ত পানি এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের স্বাদু পানির সম্মিলিত উপস্থিতির ফলে এ জেলা চিংড়ির বিচরণক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। কক্সবাজার জেলায় বাগদা চিংড়ির সর্বমোট খামার ৩৮৮৭ টি (৯১৯৪৬.৭৪ একর)। মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন চিংড়ি খামার ৭০০০ একর। খাস খতিয়ানভুক্ত চিংড়ি খামার ২৫০৭৪.৯৫ একর। অর্ধ-নিবিড় বাগদা চিংড়ি খামার ৬টি (৩১.৯৬ একর)। বাগদা চিংড়ির উৎপাদনের হার সাধারণ খামারে ১৫০-২০০ কেজি/একর (বার্ষিক) এবং অর্ধ-নিবিড় খামারে ২-৩ টন/একর (বার্ষিক)। মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ এর আওতায় ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নিবন্ধিত বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি ৪৩টি, গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ১টি। বার্ষিক বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন ৮-৯ শত কোটি। চিংড়ি ডিপো ৩৭২টি। চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ৬টি (৩টি ই.উ. অনুমোদিত)। চিংড়ির মোট উৎপাদন ২৫০০০ মেট্রিক টন। হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদনও ৩০০/৪০০ কেজি থেকে ইতোমধ্যে ৮০০০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে।

চিংড়িতে ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্তকরণ এবং চাষিদের ভাইরাসমুক্ত বাগদা চিংড়ি পি.এল. প্রাপ্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কক্সবাজার সদরে অবস্থিত কলাতলী হ্যাচারি জোনে মৎস্য অধিদপ্তরের পি.সি.আর. ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে এ ল্যাবরেটরি থেকে স্থানীয় হ্যাচারি মালিক ও চিংড়ি চাষিদের নিয়মিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। চিংড়ি সম্পদকে ভাইরাসমুক্ত করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা উৎপাদনের নিমিত্ত ভাইরাসমুক্ত মা (মাদার) চিংড়ির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই থেকে ভাইরাসমুক্ত SPF (Specific Pathogen Free) মা চিংড়ি আমদানি করে এর উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় একটি চিংড়ি হ্যাচারিকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য

অধিদপ্তরের নিবিড় মনিটরিং এ সম্প্রতি উক্ত হ্যাচারিতে ২য় প্রজন্মের পোনা থেকে মা চিংড়ি উন্নয়নের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি উক্ত কার্যক্রমের আওতায় উৎপাদিত ভাইরাসমুক্ত SPF চিংড়ি পি.এল. বিভিন্ন অর্ধ-নিবিড় চিংড়ি খামারে সরবরাহ করা হচ্ছে।

এছাড়া কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন রামপুর মৌজায় মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ৭০০০ একর জমিতে ১০ একর বিশিষ্ট ৩৪২টি, ১১ একর বিশিষ্ট ১১৯টি, ৩০ একর বিশিষ্ট ৩২ টি এবং ৩০০ একর বিশিষ্ট ১ টি চিংড়ি প্লট সম্প্রতি ৫২৩ জন চিংড়ি চাষিদের নিকট ৩য় ধাপে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা প্রদানের মেয়াদ নবায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত চিংড়ি প্লটসমূহে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রমের পাশাপাশি উন্নত পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[২২]

চিংড়ির পুষ্টিগুণ[২৩]

চিংড়ি একটি সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য। চিংড়িতে প্রোটিন, ফ্যাট ও খনিজ উপাদানের একটি স্বাস্থ্যকর ও সুষম অনুপাত বিদ্যমান রয়েছে। অন্যান্য মাছ ও মাংসের চেয়ে চিংড়িতে ক্যালরি কম থাকায় ওজন বাড়ার সম্ভাবনা কম। রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। এছাড়া প্রায় ১৪% ফসফরাস আছে যা মানবদেহের দাঁত ও হাঁড়কে মজবুত রাখে। চিংড়িতে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকায় শরীরে কোন ক্ষত সৃষ্টি হলে তা দ্রুত সারাতে সাহায্য করে। প্রায় ১৪% কপার আছে যা থাইরয়েডজনিত সমস্যা দূর করে এবং মানবদেহের গ্রন্থির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে ও থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা সহনীয় রাখে। চিংড়িতে ৮% ম্যাগনেসিয়াম আছে যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং প্রায় ৫৭% সেলিনিয়াম আছে যা শরীরে ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে বাঁধা দেয়। আবার চাহিদার প্রায় ২৫% ভিটামিন বি-১২ পাওয়া যায় চিংড়ি থেকে যা রক্তে হিমোগ্লোবিন বাড়াতে ও রক্ত স্বল্পতা দূর করতে সাহায্য করে। চিংড়িতে ভিটামিন বি-১২ ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড থাকায় হৃদপিন্ড সুস্থ রাখে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এমনকি লিভার ভাল রাখতেও সাহায্য করে। তবে যাদের শরীরে এলার্জি রয়েছে তাদের চিংড়ি খেতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

চিংড়ি শিল্পের বর্তমান অবস্থা

দেশের অন্যতম রপ্তানি খাত হিমায়িত চিংড়ি। একসময়ে পোশাক খাতের পরই ছিল এর অবস্থান। এখন সপ্তম স্থানে নেমে এসেছে।[২৪] বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এস. হুমায়ুন কবীর বলেন, “বর্তমানে বাংলাদেশে

১০৫ টি হিমায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ২৮টি টিকে আছে এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় চার লাখ মেট্রিক টন। কাঁচামাল স্বল্পতার কারণে কারখানাগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০-১৫ শতাংশ, যা কারখানা বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনুকূল নয়।"[২৫] দেশীয় চিংড়ি তথা বাগদা চিংড়ির উৎপাদন কমে যাওয়ায় ভেনামি চিংড়ি[২৬] চাষের অনুমোদন পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস অ্যাসোসিয়েশন প্রায় ১২ বছর ধরে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ভেনামি চিংড়ি ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কায় ২০০৫ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। অথচ ৩০ বছর ধরে বিশ্বের ৬২টি দেশে ভেনামি চিংড়ি বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে। বিশ্বে চিংড়ি বাণিজ্যের ৭৭ শতাংশ দখল করে আছে ভেনামি চিংড়ি। বাগদা চিংড়ির তুলনায় দাম কম হওয়ায় বিশ্ববাজারে এর চাহিদা বেশি। অবশেষে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে বিদেশী প্রজাতির এই চিংড়ি চাষের অনুমতি দেয়। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে থাইল্যান্ড থেকে এই চিংড়ির পোনা আমদানিতে দেরি হয়। আট লাখ পোনা আনা হয়েছে বিমানে করে। ভেনামি চিংড়ির জাতটি যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ের।[২৭] প্রতিবেশি দেশ ভারতে ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষ ২০০৮ সালে শুরু হয়। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে ভেনামি চিংড়ি চাষের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ৩টি পাইলট প্রকল্প অনুমোদন দিলেও বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ১টি। যশোর বিসিক শিল্পনগরের এম ইউ সি ফুডস ও সাতক্ষীরার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সুশীলন যৌথ উদ্যোগে খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং এই বিদেশী ভেনামি জাতের চিংড়ির প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষামূলক চাষ সফল হয়েছে। ইতোমধ্যে এ চিংড়ি মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে রপ্তানি করেছে উৎপাদককারী প্রতিষ্ঠান। এতে তাদের মুনাফাও হয়েছে। ১১টি প্রতিষ্ঠান ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষ করার জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের কারিগরি কমিটি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো, সক্ষমতা, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করে নতুন দুটি কোম্পানিকে এক বছর পরীক্ষামূলক চাষের অনুমোদন দিয়েছে মৎস্য অধিদপ্তর। গত বছর পরীক্ষামূলক চাষে সফলতা পাওয়ার পর মৎস্য অধিদপ্তর আরও ৮টি প্রতিষ্ঠানকে ভেনামি চিংড়ি চাষের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। এদের মধ্যে খুলনার ৬টি এবং কক্সবাজারের ২টি।[২৮]

চিত্র ৩: কক্সবাজারে পরীক্ষামূলক ভেনামি চিংড়ি চাষ

মৎস্য অধিদপ্তর কক্সবাজারের ৩টি ও চট্টগামের ১টি চিংড়ি হ্যাচারিকে পরীক্ষামূলকভাবে ভেনামি চিংড়ি উৎপাদনের অনুমতি এবং এক বছরের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: কক্সবাজারের উখিয়ার এম. কে. হ্যাচারি, কলাতলি এলাকার নিরিবিলি হ্যাচারি ও খুরুশকূল এলাকার মিডওয়ে সায়েন্টিফিক ফিশারিজ লিমিটেড ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ডাফা ফিড অ্যান্ড অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড। কক্সবাজারের নিরিবিলি হ্যাচারির স্বত্বাধিকারী লুৎফর রহমান বলেন, "বাগদা চিংড়ি চাষ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আরও ৮-৯ বছর আগেই সরকারের উচিত ছিল অধিক উৎপাদনশীল ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমোদন দেওয়া। আমরা প্রতিবেশি দেশগুলোর চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশে এখন পরীক্ষামূলক চাষের অনুমোদন পাচ্ছে। আর প্রতিবেশি দেশগুলো ভেনামি চিংড়ি বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে লাভবান হচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা শুধু বাগদা ও গলদা চিংড়ি রপ্তানি করে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছি না। সরকার ভেনামি চাষ উন্মুক্ত করে দিলে চিংড়ি রপ্তানি শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াবে।"[২৯]

দেশীয় চিংড়ি শিল্পের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে আমাদের আশা জাগাচ্ছে বাগদা চিংড়ির জিআই সনদ লাভ।[৩০] জিআই সনদ পাওয়ায় বাংলাদেশ পণ্যটি উৎপাদন করার অধিকার এবং এটি আইনি সুরক্ষা পাবে। অন্য কোনো দেশ আর এই পণ্য নিজেদের বলে দাবি করতে পারবে না। বাংলাদেশ থেকে অনেকে বাগদা চিংড়ি রপ্তানি করছে। পেটেন্ট, ডিজাইন আন্ড ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার মো. আব্দুস সাত্তার বলেন, "জিআই সনদ পাওয়ার পর বিদেশের বাজারে বিভিন্ন পণ্যের দাম ৩০ শতাশ পর্যন্ত বাড়ে। জিআই ট্যাগ ব্রান্ডিং হিসেবে কাজ করে।"[৩১]

বিশ্ব বাজারে বাগদা চিংড়িকে বাংলাদেশের বিশেষায়িত পণ্য হিসেবে তুলে ধরতে ২০১৯ সালের মে মাসে মৎস্য অধিদপ্তর জিআই স্বীকৃতির জন্য আবেদন করে। ২০২০ সালের ৬

অক্টোবর সরকারের পেটেন্ট, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেডমার্ক বিভাগ (ডিপিডিটি) গেজেট জারি করে এবং দুটি আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করে। নিয়ম অনুযায়ী জার্নালে প্রকাশের দুই মাসের মধ্যে কেউ আপত্তি না করায় সেই পণ্যের জিআই সনদ পেতে আর কোনো বাঁধা ছিল না। গত বছরের ৬ ডিসেম্বর এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনের শেষ দিন ছিল। এই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো দেশ এতে আপত্তি উথাপন না করায় প্রথম আবেদনকারী হিসেবে বাংলাদেশ ১৮ মে ২০২২ জিআই সনদ পায়।[৩২] এ কারণে বাগদা চিংড়ির একক স্বত্ব এখন শুধু বাংলাদেশের।

বাংলাদেশ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক সমিতির (বিএফএফইএ) জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি এম খলিলুল্লাহ বলেন, "বাগদা চিংড়ি জিআই সনদ পাওয়ায় দুটো ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে। একটি হলো, বিশ্ব বাজারে আমাদের নিজস্ব পণ্য হিসেবে এখন আমরা বেশি মূল্য পাব। আর দ্বিতীয়টি হলো, এখন এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগ হবে।"[৩৩]

চিংড়ি শিল্পের অপরিকল্পিত বিকাশ পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ

অপরিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিক চিংড়ি চাষের ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশের ক্ষতির মধ্যে মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, জমির উর্বরতা নষ্ট হওয়া, স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়া, বিশুদ্ধ পানির অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকা বিশেষ করে চকরিয়ায় সুন্দরবন তথা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বা প্যারাবন রয়েছে। প্যারাবন উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানির পুষ্টিচক্র সমাধান করে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে। উপকূলীয় জোয়ার-ভাটার স্বাদু ও লবণ পানির মিশ্রণ স্থলে প্যারাবন বিশেষ করে বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্যতায় সামুদ্রিক জীবদের খাদ্য আহরণ ও বেঁচে থাকার পরিবেশ সৃষ্টি করে। কক্সবাজার অঞ্চলের অধিকাংশ প্যারাবন চিংড়ি চাষের কারণে ধ্বংস হয়। অধিকন্তু জোয়ারের পানি ঢুকিয়ে চিংড়ি চাষের ফলে জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। এ লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় নানা কর্মকাণ্ডের ফলে যেমন: চিংড়ি ঘেরের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ, ঘেরে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ত পানির প্রবেশ, জলাবদ্ধতা, নদী ও খালে লবণাক্ত পানির প্রবাহ, চিংড়ির অধিক বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত লবণ দেওয়া। এ সকল কারণে ভূমির উপরে-নিচে মাটি ও পানির লবণাক্ততা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে, ফল এবং সবজির উৎপাদন কমে যাচ্ছে। চিংড়ি চাষে অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারে শস্যের উৎপাদন এবং মাটিতে জৈব উপাদানের পরিমাণও হ্রাস পায়। এক সময় যে জমিতে ধান-পাটের চাষ হতো, পলিযুক্ত দোঁআশ মাটি ছিলো তা ধীরে ধীরে লবণাক্ত পানির নিচে চলে যাচ্ছে। তাই পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পিত চিংড়ি চাষ, চকরিয়ার সুন্দরবন তথা

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রক্ষা, চিংড়ি চাষে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং সর্বোপরি জমিতে লবণাক্ততা যাতে বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য জোয়ারের পানি ঢুকানো বন্ধ করতে হবে।

চিংড়ি শিল্পের উন্নয়নে সুপারিশমালা

মুক্তবাজার অর্থনীতির বর্তমান প্রতিযোগিতায় দেশে অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে সাথে চিংড়ি শিল্পের উন্নয়নও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কক্সবাজারের স্থানীয় চিংড়ি উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, চিংড়ি বিশেষজ্ঞ, চিংড়ি চাষি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মতে এ শিল্পের উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:[৩৪]

১. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশীয় চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থাদি এবং নিবিড় চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি;

২. দেশীয় বাগদা চিংড়ির পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অধিক উৎপাদনশীল ভেনামি প্রজাতির চিংড়ির চাষের অনুমোদনসহ দেশের চিংড়ির উৎপাদন, মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলো সচল এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থাদি জরুরি ভিত্তিতে নেওয়া আবশ্যক;

৩. চিংড়ি চাষ মূলত: গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার ওপর নির্ভরশীল বিধায় মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে;

৪. যাবতীয় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রতিবেশী দেশসমূহের মতো চিংড়ি সেক্টরের জন্য বিশেষ কোনো বরাদ্দ নেই, যা করা একান্ত আবশ্যক;

৫. চিংড়ির নিবিড় চাষের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহ বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়, তার উপর শূন্য ট্যাক্স ধার্য করা ;

৬. চিংড়ি চাষের জন্য ব্যাংক ঋণের সুদের হার অন্যান্য কৃষি পণ্যের ন্যায় ৪% ও বিদ্যুৎ বিল কৃষি পণ্যের অনুরূপ করা আবশ্যক;

৭. যে সকল চাষির ভেনামি চিংড়ি চাষের সক্ষমতা আছে, তাদেরকে একটি সহজ নীতিমালার মাধ্যমে ভেনামি চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষের অনুমতি প্রদান করতে হবে;

৮. চিংড়ি চাষ এলাকার সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের উন্নয়ন সাধন জরুরি;

৯. চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণে চিংড়ি আহরণ থেকে শুরু করে জাহাজীকরণ পর্যন্ত দুষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১০. গবেষক ও উৎপাদকের মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়নের উপর চিংড়ি শিল্পের সফলতা নির্ভর করে। তাই যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এর নেতিবাচক দিক সনাক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১১. নতুন নতুন প্রযুক্তি বিষয়ে অব্যাহত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও তথ্যবহুল সম্প্রসারণ পুস্তিকা প্রণয়ন;

১২. বিগত ১ দশক যাবৎ চিংড়ির কারখানাগুলো যাবতীয় বাঁধা-বিপত্তির মধ্যে রপ্তানি কার্যক্রম চালিয়ে আসায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে অন্যান্য খাতের ন্যায় চিংড়ির কারখানাগুলোর রপ্তানির সক্ষমতা ফিরে আনা ও পুনর্বাসন জরুরি;

১৩. চিংড়ির বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণ, মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা কমানো এবং চিংড়ি চাষি যাতে সঠিক মূল্যে চিংড়ি বিক্রয় করতে পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি চাষিদের ক্ষমতায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার পাশাপাশি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে;

১৪. চিংড়িকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হিসেবে রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমূখীকরণে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি এবং সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে;

১৫. সর্বোপরি চিংড়ি শিল্পকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চাবিকাঠি হিসেবে সনাক্ত করে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে 'চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড' নামে একটি শক্তিশালী সংস্থা গঠন করে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

উপসংহার

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কক্সবাজারের চিংড়ি-শিল্প এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের যে কয়টি খাত হতে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে তার মধ্যে মৎস্য খাত, বিশেষ করে উপকূলীয় চিংড়ি সম্পদ অন্যতম। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশসম্মতভাবেই এই খাতের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উন্নয়নের প্রয়াস অব্যাহত রাখা জরুরি। প্রাথমিক পর্যায়ে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের প্রসার ঘটেছে। পরিকল্পিতভাবে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি চিংড়ি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে চিংড়ি খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কৌশল গ্রহণ খুবই জরুরি। চিংড়ি উৎপাদনে নিয়োজিত চাষিদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। চিংড়ি-

শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার। এর পাশাপাশি এ শিল্পের উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অর্জিত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের যথাযথ ব্যবস্থা থাকা দরকার। সীমিত সম্পদের এই দেশটিতে বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ সম্মত চিংড়ি চাষের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা গেলে কক্সবাজারের চিংড়ি-শিল্প আগামীতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, (ঢাকা: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২৪ আগস্ট ২০১৪), ১৭০৯৭

২. সুশীল চৌধুরী, 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : নবাবি আমল', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ফেব্রুয়ারি ২০০৭), ২৪

৩. Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire,* Vol. 1, (Oxford, 1914), 190

৪. ইফতিখার-উল-আউয়াল, দেশী শিল্প, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২৫৭

৫. *https://bn.banglapedia.org/index.php/*চিংড়ি, ৯ মার্চ ২০২৪

৬. পোল্ডার : সাধারণ অর্থে নিচু জমি। চিংড়ি ঘেরে যাতে জোয়ারের পানি প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ঘেরের চারপাশে উঁচু পাড় তৈরি করে দেওয়া হয়। যার ফলে ঘেরগুলো প্লটাকৃতির হয়। এই প্লটাকৃতির নিচু জমিকেই পোল্ডার বলা হয়।

৭. ড. এম এ মজিদ, ড. জাহাঙ্গীর আলম, 'উপকূলীয় চিংড়ি চাষ: পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট', (মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান-২০০৮), ২৩-৩০ আগস্ট, ঢাকা: আগস্ট ২০০৮, ১৪

৮. মোঃ ছেরাজ উদ্দিন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, "মৎস্য বিভাগ", *কক্সবাজারের ইতিহাস*, (কক্সবাজার: কক্সবাজার ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদিত; ৩০ জুন ১৯৯০), ৩৯৫

৯. *প্রাগুক্ত*, ৩৯৬

১০. *প্রাগুক্ত*

১১. *প্রাগুক্ত*, ৩৯৮

১২. *https://bn.banglapedia.org/index.php/*চিংড়ি ১০ মার্চ ২০২৪

১৩. কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকা (কক্সবাজার, খুরুশকুল, ঈদগাঁও) সরেজমিনে পরিদর্শন

১৪. *সাক্ষাৎকার* (চিংড়ি চাষি): মিজানুর রহমান, ঈদগাঁও, কক্সবাজার, ১৮ জুলাই ২০২২; জাহাঙ্গীর আলম, পালাকাটা, চকরিয়া, কক্সবাজার, ২৩ জুলাই ২০২২; নাসির উদ্দিন, বদরখালি, চকরিয়া, কক্সবাজার, ২৩ জুলাই ২০২২; রাশেদুল আলম, খুরুশ্কুল, কক্সবাজার, ২ আগস্ট ২০২২; মামুনুর রশিদ, মহেশখালী, কক্সবাজার, ২ আগস্ট ২০২২

১৫. *https://bn.banglapedia.org/index.php/*চিংড়ি ৮ মার্চ ২০২৪

১৬. *প্রাগুক্ত*

১৭. *Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh Fiscal Year 2015-16 to 2019-20.*

১৮. *প্রাগুক্ত*

১৯. *রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো*

২০. *প্রাগুক্ত*

২১. *http://fisheries.coxsbazar.gov.bd/bn/site/page/7EgB*-এক-নজরে ৭ মার্চ ২০২৪

২২. *প্রাগুক্ত*

২৩. *https://akkbd.com/*চিংড়ি-চাষ-একটি-সম্ভাবনার ১০ মার্চ ২০২৪

২৪. *https://bangla.thedailystar.net/*বাণিজ্য/ভেনামি-চিংড়ির-বাণিজ্যিক-উৎপাদন-আর-কত-দূর ২০ মার্চ ২০২৪

২৫. *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৭ ডিসেম্বর ২০২১

২৬. ভেনামি চিংড়ি (বৈজ্ঞানিক নাম Litopenaeus vannamei) পেনাইডি (panaeidae) পরিবারের একটি উচ্চফলনশীল চিংড়ি। এটি প্রশান্ত মহাসাগরের সাদা চিংড়ি, চিংড়ির রাজা ইত্যাদি নামেও পরিচিত। বাংলাদেশে এটি সাদা সোনা নামেও পরিচিত। এ চিংড়ি সর্বোচ্চ ২৩ সে.মি. বা ৯.১ ইঞ্চি লম্বা হয়। অন্য সকল চিংড়ির চেয়ে এ চিংড়ির উৎপাদন বেশি। হেক্টর প্রতি এ চিংড়ির উৎপাদন সাত হাজার কেজির বেশি যা বাগদার তুলনায় হেক্টর প্রতি প্রায় ছয় হাজার কেজি বেশি। তাই এ চিংড়ি চাষ বেশ লাভজনক।

২৭. *https://bangla.thedailystar.net/*বাণিজ্য/ভেনামি-চিংড়ির-বাণিজ্যিক-উৎপাদন-আর-কত-দূর

২৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ মে ২০২২

২৯. *ডেইলি স্টার বাংলা*, ২৩ মে ২০২২

৩০. জিআই সনদ: Geographical Indication বা ভৌগোলিক নির্দেশক হচ্ছে একটি প্রতীক বা চিহ্ন, যা পণ্য ও সেবার উৎস, গুণাগুণ ও সুনাম ধারণ ও প্রচার করে। কোন একটি দেশের নির্দিষ্ট ভূখন্ডের মাটি, পানি, আবহাওয়া ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এবং সেখানকার জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাহলে সেটিকে সেই দেশের জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইন্টারন্যাশনাল প্রোপার্টি রাইটস অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউআইপিও) নিয়ম মেনে বাংলাদেশের পেটেন্টস, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেডমার্ক বিভাগ (ডিপিডিটি) জিআই সনদ দেয়। বাংলাদেশের মোট ১১টি পণ্য জিআই সনদ পেয়েছে। এগুলো হচ্ছে ইলিশ মাছ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষীরশাপাতি আম, দিনাজপুরের কাটারিভোগ চাল, কালিজিরা চাল, জামদানি, ঢাকাই মসলিন, রাজশাহীর সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জি ও নেত্রকোনার বিজয়পুরের সাদা মাটি, বাগদা চিংড়ি ও ফজলি আম। ফলে এসব পণ্যে আলাদা ট্যাগ বা স্টিকার ব্যবহার করা যাবে।

৩১. *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৭ ডিসেম্বর ২০২১

৩২. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ মে ২০২২

৩৩. *প্রাগুক্ত*

৩৪. *সাক্ষাৎকার*: ড. মো. মনিরুল ইসলাম, সদস্য ও পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা, ২৭ জুন ২০২২; শেখ সোহেল পারভেজ, সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা, ২৮ জুন ২০২২; এম. খলিলুল্লাহ, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা, ২৮ জুন ২০২২; নাসির উদ্দিন, চিংড়ি চাষি, বদরখালি, চকরিয়া, কক্সবাজার, ২৩ জুলাই ২০২২; রাশেদুল আলম, চিংড়ি চাষি, খুরুশ্কুল, কক্সবাজার, ২৩ জুলাই ২০২২; আমিনুল ইসলাম, চিংড়ি চাষি, পালাকাটা, চকরিয়া, কক্সবাজার ২ আগস্ট ২০২২।